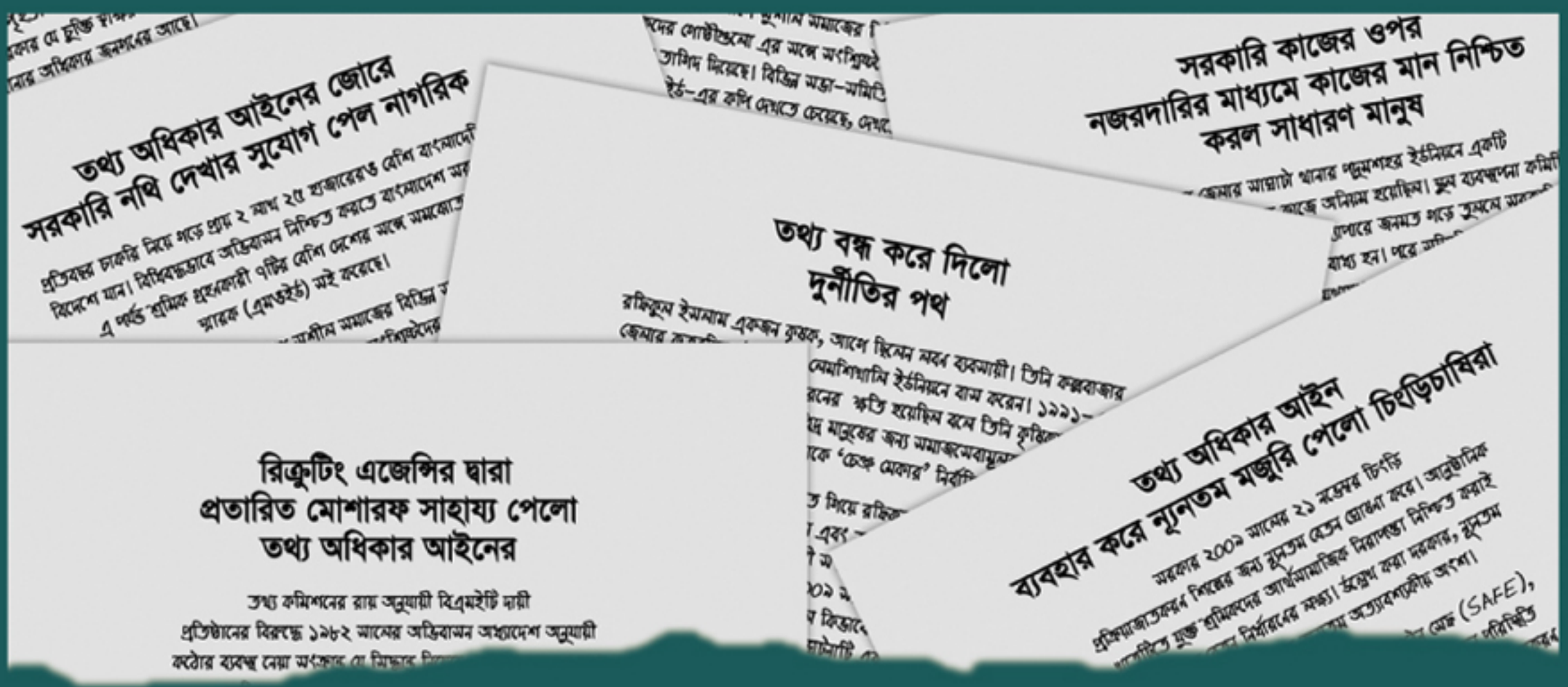

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, বাংলাদেশ

জনগণের ক্ষমতায়নের সফল কাহিনী

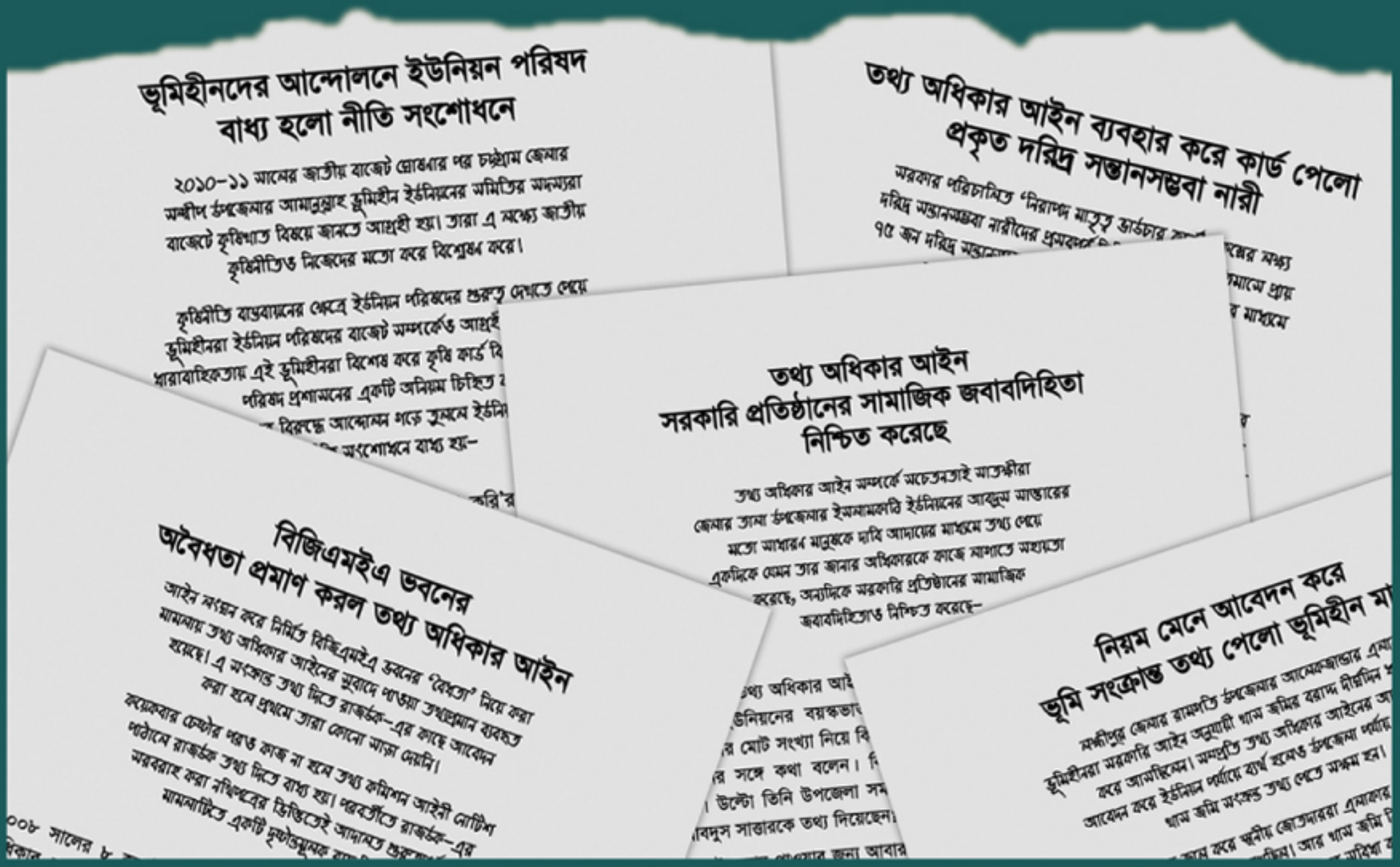

manusher jonno

promoting human rights and good governance

তথ্য অধিকার আইন

কিছু অর্জন

প্রকাশ *ডিসেম্বর ২০১১*

প্রকাশক *মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন*

গ্রন্থনা *ফারজানা নাঈম*
পরিচালক (গভর্নেন্স), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

সানজিদা সোবহান
কোঅর্ডিনেটর (গভর্নেন্স), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

শাহানা হুদা
কোঅর্ডিনেটর, মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন
ডেপুটি ম্যানেজার (আরটিআই), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

কার্টুন *সাহানারা নার্গিস*
রকিবুল হক রকি

অলংকরণ *জি এম কিরণ*

মুদ্রণ *ট্রান্সপারেন্ট*

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
বাড়ি ১০, রোড ১, ব্লক এফ, বনানী মডেল টাউন, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮-০২-৮৮২৪৩০৯, ৮৮১১১৬১, ৯৮৯৩৯১০, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৮৮১০১৬২
ওয়েব : www.manusher.org

স হ যো গি তা য়

UKaid from the Department for International Development

NORWEGIAN EMBASSY

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশে মানবাধিকার ও সুশাসন এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০২ সালে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে মানুষের কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে এই সংগঠনটি।

অন্যান্য অনেক কাজের পাশাপাশি বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রবর্তনের (আরটিআই) দাবিতে এমজেএফ তার একশ'র বেশি সহযোগী সংস্থার সঙ্গে কাজ করেছে এবং এ বিষয়ে এনজিও আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে। বর্তমানে এমজেএফ তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে এর সহযোগী সংস্থাগুলোর পাশাপাশি সরকারি সংস্থাগুলোর দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সহায়তা দিচ্ছে। সে লক্ষ্যে সরকারি কর্মকর্তা ও তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি'র) সঙ্গে একটি অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে। এছাড়াও মানুষ যেন এই আইনটি ব্যবহারে উৎসাহিত হয়ে ওঠে এবং আইনটি ব্যবহার করে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য জানতে চায় সেজন্যও বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে।

সেইসঙ্গে এমজেএফ তাদের সব সহযোগী সংস্থার স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নীতি বা ডিসক্লোজার পলিসি প্রণয়নে সহায়তা করেছে। তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার পর সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখার কাজে এমজেএফের অনেক সহযোগী সংগঠন কাজ করছে। এমন অনেক গ্রুপ আইনটি ব্যবহার করছে। বইটিতে এ ধরনের কিছু সফল উদাহরণ তুলে ধরা হল।

তথ্য বন্ধ করে দিলো দুর্নীতির পথ

রফিকুল ইসলাম একজন কৃষক, আগে ছিলেন লবন ব্যবসায়ী। তিনি কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার লেমশিখালি ইউনিয়নে বাস করেন। ১৯৯১-এর ঘূর্নিঝড়ে লবন ব্যবসার বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছিল বলে তিনি কৃষিকাজ শুরু করেন। অবসরে এলাকার দরিদ্র মানুষের জন্য সমাজসেবামূলক কাজ করেন বলে এলাকার মানুষ তাকে 'চেঞ্জ মেকার' নির্বাচিত করেছে।

চেঞ্জ মেকার হিসেবে কাজ করতে গিয়ে রফিকুল সুশাসন ও জবাবদিহিতার ওপর একটি কর্মশালায় অংশ নেন এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে একটি ধারনা পান। এমজেএফের সহযোগী সংস্থ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার ঐ কর্মশালাটি আয়োজন করেছিল ২০০৯ সালে। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে রফিকুল কিভাবে এলাকাবাসীর দাবি আদায় করেছিল নিচের ঘটনাটি এর প্রমান-

তথ্যের জন্য রফিকুলের আবেদন এবং তার ফল

২০০৯ সালের নভেম্বরে রফিকুল জানতে পারেন সরকার 'ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং' (ভিজিএফ) প্রকল্পের আওতায় লেমশিখালী ইউনিয়নের দুস্থদের মধ্যে বিনামূল্যে চাল বিতরণের পরিকল্পনা করছে। কাজের অভাব, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় খরাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে খাদ্য নিরাপত্তা দেওয়ার লক্ষ্যে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ভিজিএফ নামের এই খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচিটি চালিয়ে থাকে।

মূলত দিনমজুর, ভূমিহীন বা যাদের শূন্য দশমিক ১৫ একরের কম জমি রয়েছে, প্রতিবন্ধী বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং যাদের নিয়মিত আয়ের উৎস নেই এরকম ব্যক্তিদের সহায়তা দেওয়ার জন্য এ প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বা যখন খাবার দুষ্প্রাপ্য হয় তখন এক মাস বা কয়েক মাসের জন্য নির্বাচিত কিছু পরিবারকে রেশন হিসেবে খাবার দেওয়া হয়। তবে এ প্রকল্পের আওতায় খাবার পেতে হলে ভিজিএফ কার্ডের প্রয়োজন হয়।

বিনামূল্যে চাল বিতরণের খবর পেয়ে রফিকুল স্বপ্রণোদিতভাবেই কুতুবদিয়া উপজেলার সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কাছে জানতে চান ভিজিএফ কার্ডের বিপরীতে জনপ্রতি কী পরিমাণ চাল পাওয়া যাবে। কিন্তু ঐ কর্মকর্তা তাকে কোনো তথ্য দেননি।

পরের দিন রফিকুল প্রকল্প কার্যালয়ে যান এবং বলেন প্রকল্পটি সম্পর্কে নাগরিকদের তথ্য দেওয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব। একথা শুনে প্রকল্প কর্মকর্তা রফিকুলকে জানান লেমশিখালীর ২৭২৫ জন দুস্থের মধ্যে ১০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হবে। যদিও রফিকুল তথ্যটি জানতে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করেননি তারপরও তিনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় প্রয়োজনীয় তথ্যটি জানতে পেরেছিলেন।

তথ্য জানার ফল

ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে চাল বিতরণের দিন চাল সংগ্রহ করতে আসা লোকজনকে চেয়ারম্যান জানান প্রতিটি ভিজিএফ কার্ডের বিপরীতে ৭ কেজি চাল দেয়া হবে। এটা শুনে রফিকুল প্রত্যেককে জানান তিনি প্রকল্প কর্মকর্তার কাছ থেকে জেনেছেন ১০ কেজি করে চাল দেয়ার কথা। রফিকুলের কাছ থেকে এ কথা শোনার পর সবাই তাদের প্রাপ্য পুরোটা দাবি করল। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তখন বলেন তার পক্ষে পুরো চাল দেয়া সম্ভব নয়। কারণ এই চাল পরিবহনে এবং অন্যান্য কাজে তার অর্থ ব্যয় হয়েছে। যাই হোক মানুষ প্রকৃত বরাদ্দ জানতে পেরেছিল বলে প্রতিবাদ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত চেয়ারম্যানকে সাড়ে ৯ কেজি করে চাল দিতে বাধ্য করল তারা।

বিজিএমইএ ভবনের অবৈধতা প্রমাণ করল তথ্য অধিকার আইন

আইন লংঘন করে নির্মিত বিজিএমইএ ভবনের 'বৈধতা' নিয়ে করা মামলায় তথ্য অধিকার আইনের সুবাদে পাওয়া তথ্যপ্রমান ব্যবহৃত হয়েছে। এ সংক্রান্ত তথ্য দিতে রাজউক–এর কাছে আবেদন করা হলে প্রথমে তারা কোনো সাড়া দেয়নি।

কয়েকবার চেষ্টার পরও কাজ না হলে তথ্য কমিশন আইনী নোটিশ পাঠালে রাজউক তথ্য দিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে রাজউক–এর সরবরাহ করা নথিপত্রের ভিত্তিতেই আদালত গুরুত্বপূর্ণ এ মামলাটিতে একটি দৃষ্টান্তমূলক রায় দিয়েছে–

২০০৮ সালের ৮ জুলাই, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা) তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) আওতায় রাজধানীর ভূমির দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা— রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর কাছে কয়েকটি বিষয়ে তথ্য চেয়ে আবেদন করে। যেসব বিষয়ে তথ্য চাওয়া হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে, বিজিএমএই ভবনের প্ল্যানের অনুমোদন ছিল কি না, সরকারি জলাশয়ে ভবন নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার পেছনে যুক্তি কী ছিল এবং এর পুরো প্রক্রিয়া। আরটিআই আইন অনুযায়ী বেলা, ২০ কর্মদিবস অপেক্ষা করে। কিন্তু এতে কোনো কাজ হয়নি।

২০০৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর, বেলা, রাজউকের কাছে দ্বিতীয়বারের মতো তথ্য চেয়ে আবেদন করে। এবার একটি বাড়তি তথ্য চাওয়া হয়। সেটি হচ্ছে রাজউক কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) নিয়োগ করেছে কি না। এবারেও তারা আবেদনের কোনো উত্তর পেল না। এরপর রাজউক-এর আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিবের কাছে আপিল করা হয়। বেলা ভেবেছিল এবার গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিব রাজউকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ডিও) আরটিআই আইনের ২৪(৩) ধারা অনুযায়ী ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য সরবরাহের

আদেশ দেবেন। কিন্তু বেলা সেই আপিলেরও কোনো জবাব পেলো না। এরপর বেলা তথ্য কমিশনে অভিযোগ জানায়। অভিযোগ পেয়ে তথ্য কমিশন রাজউককে তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবী এবং আপিল কর্তৃপক্ষে নাম জানানোর নির্দেশ দেয়। এছাড়া তথ্য কমিশন রাজউককে ওই অভিযোগের ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা সাত দিনের মধ্যে জানাতে নির্দেশ দেয়। বলা হয়, অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। রাজউক যথারীতি নীরব থেকে কমিশনের নির্দেশ অমান্য করে।

২০১০ সালের ২২ জুলাই রাজউকের চেয়ারম্যানের কাছে আইনি নোটিস পাঠানো হয়। অবশেষে বেলাকে ১৯ সেপ্টেম্বর কাঙ্ক্ষিত তথ্য দেয় রাজউক। ওই তথ্যে স্পষ্টতই দেখা যায় অনুমোদনের সঙ্গে বেঁধে দেয়া শর্ত আদৌ মানা হয়নি। ২০১০ সালের ২ অক্টোবর একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়, রাজউকের অনুমতি ছাড়াই বিজিএমইএ ভবন নির্মিত হয়েছে। খবরটি সরকারসহ সব মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। বিষয়টি ক্রমে আন্দোলনে রূপ নেয়।

তথ্য চাইলে দিতে হবে, আইন বলেছে তাই
অজুহাত দিয়ে এড়িয়ে যাবার, কোন সুযোগ এখন যে আর নাই

বেলা'র আইনজীবীরা তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সংগৃহীত নথিপত্র আদালতে পেশ করেন। বেলা প্রধান নির্বাহী রিজওয়ানা হাসান এক শুনানিতে বলেন, এটি (ভবনটির নির্মাণ) পরিবেশগত কনভেনশনসহ কিছু আইন ভঙ্গ করেছে। ঢাকার হাতিরঝিল এলাকায় বিজিএমইএ ভবনের (বিজিএমইএ টাওয়ার) নির্মাণ প্রচলিত আইনের লঙ্ঘন এবং বিদ্যমান দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থার চরম বহিপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। যে জমিতে ভবনটি নির্মিত হয়েছে তার সরকারি নিবন্ধন ছিল না। ওই জমিতে কোনো কাঠামো নির্মাণের অনুমোদনও ছিল না। ভবনটির নির্মাণের সময় ১৯৫৩ সালের নগর উন্নয়ন আইন (আরবান ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট) এবং জলাশয় সংরক্ষণ আইন মানা হয়নি। আর জমিটির প্রকৃত মালিক বিজিএমইএ নয়, বরং বাংলাদেশ রেলওয়ে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) জমিটি বাংলাদেশ রেলওয়ের কাছ থেকে কিনেছিল। পরে ইপিবি তা বিজিএমইএ-র কাছে বিক্রি করে দেয়। এ বিষয়ে আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, সরকার জনস্বার্থে জমিটি অধিগ্রহণ করেছিল। সরকারের সাংবিধানিক অধিকারের বলে তা করা হয়েছে। কিন্তু সরকার কোনো বেসরকারি কোম্পানির কাছে তা বিক্রি করতে পারে না। অধিগ্রহণের মাধ্যমে জনস্বার্থ পূরণ না হলে আইন অনুযায়ী সরকারের উচিত জমি মূল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া।

আদালত রায় দেয়—এ ধরণের একটি স্থানে কোনো ভবন তৈরির আগে কিছু শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। রায়ে উল্লেখ করা হয়, ভবনটি যে জমিতে নির্মিত হয়েছে বিজিএমইএ তার মালিক নয়। কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই এটি উচ্ছেদ করতে হবে। আইনভঙ্গ করা ও অন্যান্য উদ্বেগের কারণে বিজিএমইএ ভবন ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভবনটি থেকে তাদের অফিস সরিয়ে নিতে সময় দেয়া হয়। আদালত অভিমত দেয়, হাতিরঝিল প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ীই হতে হবে। বেলা এখনো পূর্ণাঙ্গ রায়ের কপি পায়নি। তবে শেষ পর্যন্ত ফল যা-ই হোক প্রভাবশালী লোকদের জন্য এই রায় একটি চরম সতর্কতা হিসেবে কাজ করবে। এ মামলা প্রমাণ করেছে, তথ্য অধিকার আইন সাধারণ মানুষকে তাদের বক্তব্য ও অধিকার তুলে ধরা এবং তা প্রতিষ্ঠায় কার্যকরভাবে সহায়তা করতে পারে।

নিয়ম মেনে আবেদন করে
ভূমি সংক্রান্ত তথ্য পেলো ভূমিহীন মানুষ

লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার আলেকজান্ডার এলাকার ভূমিহীনরা সরকারি আইন অনুযায়ী খাস জমির বরাদ্দ দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছিলেন। সম্প্রতি তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদন করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যর্থ হলেও উপজেলা পর্যায় থেকে তারা খাস জমি সংক্রন্ত তথ্য পেতে সক্ষম হন।

কাগজপত্রে জাল করে স্থানীয় জোতদাররা এলাকার খাস জমির বেশিরভাগ দখল করে রেখেছিল। আর খাস জমি বিতরণে সরকারি কর্মচারীদের অসততা ও নিস্পৃহ ভাব তাদের সুবিধা করে দিয়েছিল। এ বছর ভূমিহীনদের সমিতি তথ্য অধিকার আইনের সহায়তায় এলাকার খাস জমির প্রকৃত অবস্থ জানতে উদ্যোগী হয়–

প্রথম ব্যর্থতা

আলেকজান্ডার এলাকার ভূমিহীন সমিতির সদস্য রিয়াজ ২০১০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ইউনিয়নের সহকারী ভূমি কর্মকর্তার কাছে খাস জমির তথ্য চেয়ে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদন করেন। সহকারী ভূমি কর্মকর্তা আবেদনটি গ্রহণ করে তাতে স্বাক্ষর করে দেন। নির্ধারিত দিনে তথ্য আনতে গেলে রিয়াজকে তথ্য না দিয়ে তাকে আবার উপজেলা ভূমি কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে বলা হয়।

দ্বিতীয় আবেদনে সাফল্য

ভূমিহীন সমিতির একটি সভায়, ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অসহযোগিতার ব্যাপারে উপজেলা প্রশাসনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ করার সিদ্ধান্ত হয়। ২৪ নভেম্বর একশরও বেশি ভূমিহীন মানুষ মিছিল করে উপজেলা ভূমি অফিসে যান। তারা উপজেলা ভূমি অফিসের তথ্য কর্মকর্তার কাছে মৌখিকভাবে অভিযোগ করেন যে, ইউনিয়ন ভূমি অফিস কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই তাদেরকে তথ্য দেয়নি।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) ভূমিহীনদের সম্মিলিত দাবির মুখে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের বিষয়টি নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দেন। সহকারী কমিশনার বলেন, উপজেলা ভূমি অফিসে একজন তথ্য কর্মকর্তা কর্মরত আছেন এবং তাঁর কাছে আবেদন করলে যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য পাওয়া যায় তারা সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন। এর প্রেক্ষাপটে ঐদিনই সিদ্দিকুর রহমান নামে একজন ভূমিহীন কৃষক উপজেলা ভূমি অফিসের তথ্য কর্মকর্তার কাছে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন।

খাস জমি সংক্রান্ত যা যা তথ্য ভূমিহীনরা জানতে চেয়েছিল, উপজেলা ভূমি অফিসের তথ্য কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সবই সরবরাহ করেন। এ ব্যাপারে ভূমিহীনদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, মৌখিকভাবে অভিযোগ করলে কোনো ফল হবে না। এ কারণেই ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অসহযোগিতার ব্যাপারে প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বা নিতে পারেনি। ভূমিহীনরা সিদ্ধান্ত নেন এর পর থেকে অভিযোগ করলে তা লিখিত এবং যৌথভাবে করতে হবে।

যেকোনো সরকারি খাসজমি ও জলাভূমি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ভূমিহীন, দরিদ্র, বিধবা, সহায়-সম্পত্তিহীন মানুষের রয়েছে সবার আগে অধিকার। ভূমিহীন মানুষকে এই তথ্য জানানো আমাদের সবার দায়িত্ব।

সরকারি কাজের ওপর নজরদারির মাধ্যমে কাজের মান নিশ্চিত করল সাধারণ মানুষ

গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানার পদুমশহর ইউনিয়নে একটি সরকারি স্কুলভবন সম্প্রসারণের কাজে অনিয়ম হয়েছিল। স্কুল ব্যবস্থপনা কমিটির সঙ্গে ভূমিহীন নেতারা যুক্ত হয়ে এ ব্যাপারে জনমত গড়ে তুললে সরকারি কর্তৃপক্ষ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিতে বাধ্য হন। পরে সম্মিলিত চাপের মুখে ঠিকাদারও কাজটি যথাযথভাবে শেষ করেন–

মজিদের ভিটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থান পদুমশহর ইউনিয়নে। সরকারি বিদ্যালয় হলেও এতে জায়গার অভাবসহ বিভিন্ন সমস্যা ছিল। এ কারণে যথাযথভাবে শিক্ষাদান কার্যক্রম চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে শিক্ষকরা বিদ্যালয় ভবনের সম্প্রসারণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেন। ২০১০-২০১১ সালের নির্বাচনে ভূমিহীন সমিতি নেতা ফজলুল হক স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর ফজলুল হক বিদ্যালয় ভবনের সম্প্রসারণের ব্যাপারে ভূমিহীন সমিতির সদস্যদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। সদস্যরা স্কুল ভবন সম্প্রসারণের দাবিতে তিন হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। ভূমিহীন নেতাদের সমর্থন পেয়ে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি ভবন সম্প্রসারণের দাবিতে সবার স্বাক্ষরসহ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে একটি স্মারকলিপি দেন।

ভবন সম্প্রসারণের আবেদনটি এক সময় অনুমোদিত হয়। এ সংক্রান্ত প্রকল্পটির নাম দেয়া হয় 'অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ'। ২০১০ সালের জুন মাসে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রকৌশল দপ্তর থেকে টেন্ডার আহ্বান করে। আবদুল হামিদ বাবু সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়ায় তাকে কাজ দেওয়া হলেও, বাবু কাজটি স্থানীয় ঠিকাদার এনামুলকে সাব-কন্ট্রাক্ট দেন। কিন্তু এনামুল কাজের মান নিয়ে খুব একটা মনোযোগী ছিলেন না।

সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের অনেক হিসাব আমাদের পাওয়ার কথা, জানার কথা। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা তা জানতে পারি না। প্রশ্নগুলো মনেই থেকে যায়। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে এরকম অনেক কিছুই আমরা জানতে পারব

এটা দেখে ভূমিহীন সমিতি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অফিসের কাছে প্রকল্পটি সম্পর্কে তথ্য জানতে চায়। তারা যেসব তথ্য চায় তার মধ্যে ছিল ভবনের নকশা এবং উপকরণের স্পেসিফিকেশন। ২৬ সেপ্টেম্বর সমিতি এই তথ্য হাতে পাওয়ার পর নির্মাণ প্রকল্পটির পরিকল্পনা এবং প্রকৃত কাজের মধ্যে তারা অমিল দেখতে পায়। তখন ভূমিহীনরা নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে তাদের নির্মাণ প্ল্যান দাবি করেন। প্রতিষ্ঠানটি দাবি না মেনে হুমকি দেয় এবং তাদের ওপর হামলা করার চেষ্টা করে। এ ঘটনার পর সমিতি উপজেলা প্রকৌশলী এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল কার্যালয়ে স্মারকলিপি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ ছাড়া তারা এ নিয়ে জনমত তৈরি ও সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে ঠিকাদারের ব্যর্থতা তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেয়।

ভূমিহীনরা ২৯ সেপ্টেম্বর উপজেলা প্রশাসনের প্রকৌশলীর কাছে একটি স্মারকলিপি ও প্রায় দুশো লোকের স্বাক্ষর জমা দেয়। স্মারকলিপি দেওয়ার পর ভূমিহীন সমিতি সবাই মিলে নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেয়। ১০ অক্টোবর উপজেলার সরকারি প্রকৌশলী, প্রধান নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক আবদুল হামিদ এবং পদুমশহর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পরিস্থিতি দেখতে ঘটনাস্থলে আসেন। প্রায় তিনশ নারী-পুরুষ তাদের সমর্থন জানান। তদন্তে প্রমাণিত হয় যে, স্কুলভবনের ভিত তৈরি করতে যথাযথ উপকরণ ব্যবহৃত হয়নি। ভূমিহীন সমিতির সদস্যরা কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দাবি করেন।

এগুলো হচ্ছে—

১) কেন ঐ উপঠিকাদারকে কাজ দেয়া হলো

২) নির্মাণকাজের তথ্য চাওয়া হলেও ঠিকাদার কেন তা দেয়নি

৩) কেন বাইরের নির্মাণকর্মী নিয়োগ করা হলো

৪) কেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক নিয়মিত কাজ দেখতে আসেননি

ভূমিহীনদের প্রশ্ন শোনার পর প্রকৌশলী স্বীকার করেন যে, তত্ত্বাবধানের কাজে ঘাটতি ছিল। এর কারণে প্রকল্পে কিছু পরিবর্তন আনা হলো। মূল ঠিকাদারকে নিজেদের কাজটি করতে বলা হলো। তারা স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ভিতটা নতুন করে তৈরি করেন। প্রকৌশলী নিয়মিত ভবনটি পরিদর্শনেরও অঙ্গীকার করেন। ভূমিহীনদের হস্তক্ষেপ ও প্রচেষ্টার ফলে স্থানীয় শ্রমিকদের দিয়েই স্কুল ভবন সম্প্রসারণের কাজ ৯ নভেম্বর সফলভাবে শেষ হয়।

ভূমিহীনদের আন্দোলনে ইউনিয়ন পরিষদ বাধ্য হলো নীতি সংশোধনে

২০১০–১১ সালের জাতীয় বাজেট ঘোষণার পর চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার আমানুল্লাহ ভূমিহীন ইউনিয়নের সমিতির সদস্যরা বাজেটে কৃষিখাত বিষয়ে জানতে আগ্রহী হয়। তারা এ লক্ষ্যে জাতীয় কৃষিনীতিও নিজেদের মতো করে বিশ্লেষণ করে।

কৃষিনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের গুরুত্ব দেখতে পেয়ে ভূমিহীনরা ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট সম্পর্কেও আগ্রহী হয়ে ওঠে। এর ধারাবাহিকতায় এই ভূমিহীনরা বিশেষ করে কৃষি কার্ড বিতরণ নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনের একটি অনিয়ম চিহ্নিত করে। তারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুললে ইউনিয়ন পরিষদ নীতি সংশোধনে বাধ্য হয়–

আমানুল্লাহ ইউনিয়নের ভূমিহীনরা প্রথমে 'নিজেরা করি'র সহায়তায় 'জাতীয় কৃষি নীতি ২০১০'-এর একটি কপি সংগ্রহ করেন। তারা এটি পড়ে জানতে পারেন যে ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে কৃষি নীতি বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এটি জানতে পেরে ভূমিহীনদের সমিতি ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট ও উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে জানার উদ্যোগ নেয়। সংগঠনটি একপর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎসের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

ভূমিহীন সমিতির সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের ২০১০-২০১১ সালের বাজেট সংগ্রহ করার জন্য ২০১০ সালের ৩ আগস্ট ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন করেন। ভূমিহীনরা বাজেট বিশ্লেষণ করে দেখে যে এলাকাবাসীর প্রয়োজন নয় বরং পরিষদের ব্যক্তিদের নিজেদের খেয়ালখুশিমতো স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পগুলো নেয়া হয়েছে। ভূমিহীনরা ঠিক করে তারা এলাকার মানুষের প্রয়োজনের ভিত্তিতে সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার দাবি জানাবে।

তথ্যের জন্য ভূমিহীনদের দাবি উত্থাপন

এদিকে ইতোমধ্যে আমানুল্লাহ ইউনিয়নে সরকারের কৃষি ভর্তুকির কার্ড বিতরণ শুরু হয়ে গেলে ভূমিহীন সমিতি সিদ্ধান্ত নেয় কৃষি কার্ড বিতরণের জন্য কৃষক যেসব বাছাই করা হয়েছে, প্রথমে তারা তা যাচাই করবে।

২০১০ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কৃষি কার্ড বিতরণ কর্মসূচি উদ্বোধনের জন্য আমানুল্লাহ ইউনিয়ন পরিষদ একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। সরকারি কর্মকর্তা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং এলাকার লোকজন এতে অংশ নেয়। উদ্বোধনী ভাষণের পর ভূমিহীন সমিতির সদস্য শাহ আলম দাবি তোলেন কৃষি কার্ড পাওয়ার যোগ্য কৃষকদের কিভাবে মনোনীত করা হবে তা সবাইকে জানানো হোক।

শাহ আলম আরো জানতে চান—

১) খসড়া তালিকাটি সবার সামনে প্রকাশ করা হবে কি না

২) সবার মতামত নিয়ে এটি চূড়ান্ত করা হবে কি না

৩) কার্ড পেতে কৃষকদের টাকা দিতে হবে কি না

সভায় উপস্থিত সবাই এ দাবির প্রতি সমর্থন জানায়। উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা কার্ড বিতরণ সম্পর্কে বলেন, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রথমে কৃষক বাছাই করবেন। উত্থাপিত প্রস্তাবসহ খসড়া তালিকাটি পাঠানো হবে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কাছে। এরপর উপজেলা পরিষদের ইস্যু করা কার্ডগুলো কৃষকদের কাছে বিতরণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের কাছে পাঠানো হবে। কৃষকরা সেখান থেকে কার্ড সংগ্রহ করবেন। এ জন্য তাদের কোনো অর্থ দিতে হবে না।

ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের নামে অবৈধভাবে টাকা দাবি

কিন্তু কৃষকরা পরে আমানুল্লাহ ইউনিয়ন পরিষদে গেলে ইউপি সচিব তাদের কাছ থেকে কার্ডের জন্য ২০ টাকা করে দাবি করেন। এই টাকা চাওয়ার কথা শিগগিরই সবার মধ্যে জানাজানি হয়। ভূমিহীন সমিতি এ বিষয়ে আরো তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়। সমিতির নেতৃত্বে ২৮ অক্টোবর চারশোর বেশি নারী-পুরুষ ইউনিয়ন পরিষদে সমবেত হন। সচিব জানান, ইউনিয়ন পরিষদের রাজস্ব ভান্ডার সমৃদ্ধ করতেই কার্ডের জন্য ২০ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। সমবেতরা বলেন, বাজেটে ও সরকারি বিধানে ২০ টাকা আদায়ের কোনো কথা লেখা নেই।

জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা

পরে সবার হৈচৈ-এর মুখে চেয়ারম্যান বলেন, ইউনিয়ন পরিষদ তার নিজস্ব আয় হিসাবে কার্ডপ্রতি ২০ টাকা দাবি করতে পারে না। পরিষদের আয়ের উৎস সরকারের বিধান দ্বারা নির্দিষ্ট করা আছে। আমরা আমাদের আয় বাড়ানোর জন্য ২০ টাকা করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। কারণ উন্নয়ন কাজের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যথেষ্ট নয়। তবে আমাদের উচিত ছিল আপনাদের সঙ্গে আগে আলাপ করা। আমরা তা করিনি। এটা আমাদের একটা বড় ভুল। আমরা এ জন্য দুঃখিত। আগামীতে আর এরকম হবে না। আমি কথা দিচ্ছি এখন থেকে আলোচনার মাধ্যমে ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য সবাই মিলে কাজ করব।

ফলাফল ও শিক্ষণীয় বিষয়

ভূমিহীনরা ইউনিয়ন পরিষদের দেওয়া তথ্য চ্যালেঞ্জ করেছিল। এর ফলে ৩শ কৃষক পরিবার ঘুষ না দিয়ে কার্ড পেতে সক্ষম হয়। ভূমিহীনরা বুঝতে পারে এককভাবে আবেদন করলে তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়। জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও তথ্য প্রাপ্তির জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করা প্রয়োজন।

জ্যোৎস্নার প্রতিবাদ নিশ্চিত করল গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা

বাগেরহাট জেলার দড়াটানা বস্তির মেয়ে জাকিয়া আক্তার জ্যোৎস্না। শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তি আর জনসেবার মনোভাবের জোরে একজন দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীতে পরিনত হলো। শুধু তাই নয়, তার সচেতনতা ও দাবি আদায়ের শক্তি অসংখ্য নিপীড়িত গ্রামীন নারীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করল–

নিজেরা খুব দরিদ্র হলেও অন্যদের জন্য জ্যোৎস্নার খুব মায়া। কেউ কোনো অসুখ-বিসুখ বা সমস্যায় পড়লেই জোৎস্না তার কাছে ছুটে যেত। একদিন জীবিকার প্রয়োজনে জ্যোৎস্নাকে গ্রাম ছেড়ে ঢাকা যেতে হয়। সে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে চাকরি নেয়। সেখানে কিছুদিন কাজ করার পর সে আবার গ্রামে ফিরে আসে। সেখানে একদিন সদ্য মা হওয়া তার এক প্রতিবেশী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে জ্যোৎস্না সেখানে ছুটে যায়। মা ও শিশুর অবস্থা দেখে সে তাদের দুজনকেই মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করে কোন চিকিৎসা না পেয়ে তারা ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

কয়েক দিন পর প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে জানানোর জন্য শাপলা ফুল নামের একটি এনজিও থেকে একজন নারী জ্যোৎস্নাদের গ্রামে আসেন। গ্রামের নারীরা বুঝতে পারেন অধিকার পেতে হলে তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তারা ২৫ জন নারীকে নিয়ে 'গ্রাম উন্নয়ন কমিটি' গঠন করেন। কমিটির সদস্যরা সবাই মিলে জ্যোৎস্নাকে চেয়ারম্যান মনোনীত করে। এভাবেই সেখানে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার আন্দোলনটি শুরু হয়। নিয়মিত মাসিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। শাপলাফুল এর পক্ষ থেকে প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রসূতি মায়েদের সেবা দেয়ার পদ্ধতি, এসব সেবা পাওয়ার স্থান এবং এ সংক্রান্ত অধিকার প্রতিষ্ঠার উপায় সম্পর্কে জানানো হয়।

জ্যোৎস্না এ প্রসঙ্গে বলে, 'মাতৃস্বাস্থ্য সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। আমরা এখন সচেতন ও সাহসী। এখন আর সেবা না নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে

আসতে হবে না আমাদের।' এভাবে একটি বছর কেটে যায়। এর মধ্যে জ্যোৎস্না বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়ে তার অধিকার সম্পর্কে আরো সচেতন হয়ে ওঠে। সে প্রতিবেশী নারীদেরও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করতে থাকে। একদিন তাকে আবার এক প্রসূতি মাকে 'মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে' নিয়ে যেতে হয়। সেখানকার কর্মীদের কাছ থেকে এবারও তারা দুর্ব্যবহার পেলো। কিন্তু এবার আর নীরব থাকেনি জ্যোৎস্না। সে এরকম ব্যবহারের প্রতিবাদ করে। জ্যোৎস্নার কণ্ঠস্বর শুনে ডাক্তার বেরিয়ে এসে রোগীকে তার কক্ষে নিয়ে যান। তিনি রোগীকে যথাযথভাবে পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন। তবে তাদেরকে বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে হয়।

কয়েক দিন পর শাপলাফুল একটি গণশুনানি বৈঠকের আয়োজন করে। এ বৈঠকে জ্যোৎস্না হাসপাতালে ওষুধ না পাওয়ার বিষয়টি উত্থাপন করে। উপস্থিত চিকিৎসক এ অভিযোগ শোনেন এবং আশ্বাস দেন ভবিষ্যতে রোগীরা ঠিকমতো ওষুধ পাবে। জোৎস্নার দায়িত্ব আরো বেড়ে গেছে। গ্রাম উন্নয়ন কমিটি বৈঠকে তো নিয়মিত যেতে হতোই, অনেক সময় রোগীদের সঙ্গে হাসপাতালেও যেতে হয়। জোৎস্না সেখানকার চিকিৎসকদের কাছে চেনামুখে পরিণত হয়েছে। জ্যোৎস্না এ ব্যাপারে বলল, 'এখন আমি রোগী নিয়ে হাসপাতালে গেলে ডাক্তাররা আমার সঙ্গে কথা বলেন। ভালো ব্যবহার করেন। আমি কখনই আশা করি নাই তারা এত ভালো আচরণ করবেন।'

রিক্রুটিং এজেন্সির দ্বারা প্রতারিত মোশারফ সাহায্য পেলো তথ্য অধিকার আইনের

তথ্য কমিশনের রায় অনুযায়ী বিএমইটি দায়ী
প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ১৯৮২ সালের অভিবাসন অধ্যাদেশ অনুযায়ী
কঠোর ব্যবস্থা নেয়া সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা বাংলাদেশে তথ্য
অধিকার আইন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বড় অর্জন।

মামলার বাদী মোশারফ ও তার এলাকার মানুষজন
এ রায়ে খুবই খুশি। এ ঘটনায় প্রমানিত হয়েছে যে, বিদ্যমান
প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা না গেলে এই
আইন অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে পারে–

ঘর ও জমি বিক্রি ছাড়াও চড়া সুদে ঋণ করেছিলেন কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা মোশারফ হোসেন। এভাবে তিনি মোট ৩ লাখ ৯ হাজার টাকা জোগাড় করে তুলে দেন মেসার্স আল-মোখলেস ট্রেড এন্টারপ্রাইজ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে। কারণ এই প্রতিষ্ঠানটির মারফত তার তিন ছেলে মুরাদ হোসেন, আসিফ হোসেন ও জাকির হোসেনের বিদেশে যাওয়ার কথা।

দিন যায়, মাস যায় এমনকি বছর চলে যায় কিন্তু রিক্রুটিং এজেন্সির কাছ থেকে কোনো খবর পাওয়া যায় না। একপর্যায়ে মোশারফ আশা ছেড়ে দেন। তার ১২ সদস্যের বিশাল পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ততদিনে আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। এমন একটি পরিস্থিতিতে মোশারফের সঙ্গে এএইচআরডিটি'র (অ্যাসিস্ট্যান্স ফর হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট উইথ টেকনোলজি) যোগাযোগ হয়। মোশারফ অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত কমিটি এমআরপিসি'র সদস্য হন। এর

মাধ্যমে তিনি অভিবাসন সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে পারেন। মোশারফ জানতে পারেন সরকারের জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতারণার ব্যাপারে অনলাইনে অভিযোগ নিয়ে থাকে। তিনি তখন এমআরপিসি ও এএইচআরডিটি'র কাছে এ বিষয়ে সহায়তা চান।

২০১০ সালের আগস্টে মোশারফ হোসেন বিএমইটি'র কাছে রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতারণার ব্যাপারে অনলাইনে অভিযোগ করেন। এছাড়া তিনি শুনানির আশায় চারবার নিজে বিএমইটিতে যান। কিন্তু এতে কোনো কাজ হয়নি। এমআরপিসি বা এএইচআরডিটি ও তাকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারছিল না।

তথ্য অধিকার আইনে আবেদন এবং তার ফল

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে কুমিল্লার দাউদকান্দিতে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে একদিনের একটি কর্মশালার আয়োজন করেছিল। এমআরপিসি বা এএইচআরডিটি'র স্থানীয় সদস্যরা এতে অংশ নেন। এর মাধ্যমে তারা শেখেন এই আইনের বিভিন্ন ধারার সহায়তা নিয়ে কীভাবে অধিকার হরণের বিষয়ে প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে। এই আইনের সহায়তা নিয়ে প্রতারিত শ্রমিকরা প্রতিকার পেতে পারেন জেনে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা খুবই অনুপ্রাণিত হন এবং এলাকার মানুষকে এ বিষয়ে অবহিত করেন।

মোশারফও তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানতে পারেন। এরপর তিনি এমআরপিসি বা এএইচআরডিটির সহায়তায় এ বছরের মার্চে বিএমইটি'র কাছে আরটিআই এর সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করে তার অভিযোগের বিষয়ে রায়ের একটি কপি চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব পাননি মোশারফ। এ কারণে এপ্রিল মাসে তথ্য কমিশনের কাছে তথ্যটি চেয়ে আবার আপিল করেন। এবার তিনি সফল হলেন। মে মাসে বিএমইটি মহাপরিচালকের কাছ থেকে তিনি রায়ের ব্যাপারে একটি চিঠি পেলেন। এতে বলা হয়, মোশারফের অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সিকে নির্দেশ দেয়া হয় মোশারফকে ১৫ জুনের মধ্যে ২ লাখ ৫২ হাজার টাকা দিতে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, এর অন্যথা হলে বিএমইটি দায়ী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ১৯৮২ সালের অভিবাসন অধ্যাদেশ অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

তথ্য অধিকার আইনের জোরে সরকারি নথি দেখার সুযোগ পেল নাগরিক

প্রতিবছর চাকরি নিয়ে গড়ে প্রায় ২ লাখ ২৫ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশি বিদেশে যান। বিধিবদ্ধভাবে অভিবাসন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত শ্রমিক গ্রহণকারী ৭টির বেশি দেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করেছে।

এই এমওইউ স্বাক্ষরের আগে সুশীল সমাজের বিভিন্ন সংগঠন ও অভিবাসী শ্রমিকদের গোষ্ঠীগুলো এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের (স্টেকহোল্ডার) সঙ্গে আলোচনার তাগিদ দিয়েছে। বিভিন্ন সভা-সমিতি ও আলোচনায় এরা স্বাক্ষরিত এমওইউ-এর কপি দেখতে চেয়েছে, দেখতে চেয়েছে এতে অভিবাসী কর্মীর অধিকারের বিষয়গুলো সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না। এমওইউগুলোতে কোনো ত্রুটি আছে কিনা তা চিহ্নিত করার জন্য এটি খতিয়ে দেখা খুবই জরুরি।

কিন্তু এ দাবির মুখে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সরকারি গোপনীয়তার দোহাই দিয়ে নিস্পৃহতা দেখিয়ে আসছে। এর ফলে জনগণ এতদিন জানত না যে সরকার যে চুক্তি স্বাক্ষর করছে বা করবে সে সম্পর্কে জানার অধিকার জনগণের আছে।

২০১০ সালের ২ নভেম্বর মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও মানবাধিকারকর্মী খন্দকার রেজওয়ানুল করিম তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। তিনি এ আইনের আওতায় বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (এমওইউ)-এর একটি কপির জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে আবেদন করেন।

সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সে বছরের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে তাকে ওই এমওইউ-এর একটি কপি দেন। এতে করে মানবাধিকার কর্মীদের দীর্ঘদিনে একটি দাবি পূরণ হলো। অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে কর্মরর্তা বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি এখন খুব সহজেই এমওইউগুলো হাতে পাবে এবং এর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে সরকারকে সহায়তা করতে পারবে।

রোগ সারাতে রোগীর লাগে
ওষুধ আর পথ্য
প্রশাসনের রোগ সারাতে
অবাধ করো তথ্য

তথ্য অধিকার আইন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতাই সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার ইসলামকাঠি ইউনিয়নের আবদুস সাত্তারের মতো সাধারণ মানুষকে দাবি আদায়ের মাধ্যমে তথ্য পেয়ে একদিকে যেমন তার জানার অধিকারকে কাজে লাগাতে সহায়তা করেছে, অন্যদিকে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সামাজিক জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করেছে–

আবদুস সাত্তার তথ্য অধিকার আইনের আওতায় উপজেলা সমাজকল্যাণ কর্মকর্তার কাছ থেকে ইউনিয়নের বয়স্কভাতা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করেন। সেই তথ্যে উপকারভোগীর মোট সংখ্যা নিয়ে কিছু অসঙ্গতি দেখেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি ইউপি চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু ইউপি চেয়ারম্যান সঠিক তথ্য জানাতে পারেননি। উল্টো তিনি উপজেলা সমাজকল্যাণ কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করেন, কেন তিনি আবদুস সাত্তারকে তথ্য দিয়েছেন?

সাত্তার স্পষ্ট জবাব পাওয়ার জন্য আবার সমাজকল্যাণ কর্মকর্তার কাছে গেলে তিনি বলেন, অডিটের পর সঠিক তথ্য জানাতে পারবেন। অডিট করার পর কর্মকর্তা সাত্তারকে জানান, ইউনিয়নে এর মধ্যে কয়েকজন উপকারভোগীর মৃত্যু হওয়াতেই সংখ্যায় অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা আবদুস সাত্তারকে তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর যথাযথভাবে আবেদন করতে বলেছেন। অডিট সম্প্রতি শেষ হয়েছে। জানা গেছে, আবদুস সাত্তার খুব শিগগিরই আবার যথানিয়মে এ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আবেদন করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

আর এটি সম্ভব হয়েছে 'স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার প্রকল্প প্রতিষ্ঠা' এবং 'প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পে কমিউনিটি স্কোরকার্ড' গঠনের

ফলে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে অগ্রগতি সংস্থা তথ্যপ্রাপ্তির ব্যাপারে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় লক্ষণীয় সাফল্য পেয়েছে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় অগ্রগতি সংস্থা তথ্য অধিকার বিষয়ক এই দুটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

এর মধ্যে এলাকার মানুষের বিভিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'সামাজিক উদ্যোগ ফোরাম' নামে একটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হয়েছে। ইউনিয়নটিতে কমিউনিটি স্কোর কার্ডের প্রথম চক্রের আওতায় কাজ করা হচ্ছে বিধবা ভাতা নিয়ে। পরিচিতি অনুষ্ঠান ও অন্যান্য কার্যক্রমের সময় উপকারভোগীদেরকে সেবাদাতার কার্যকলাপের ওপর নজরদারি করার পরামর্শ দেয়া হয়। এই ইউনিয়ন সামাজিক উদ্যোগ ফোরামের সদস্য ছিলেন আবদুস সাত্তার।

অন্যদিকে আরেকটি বিষয়ে অগ্রগতি সংস্থার প্রকল্প কর্মকর্তা উপজেলা সমাজকল্যাণ কর্মকর্তার কাছে কিছু তথ্য চান। কর্মকর্তা ওসব তথ্য দিতে ইতস্তত করেন। তখন প্রকল্প কর্মকর্তা তাকে মনে করিয়ে দেন তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তিনি তথ্য দিতে বাধ্য। কর্মকর্তা তখন তাকে বিধি অনুযায়ী আবেদন করতে বলেন। আবেদন করার পর তিনি প্রকল্প কর্মকর্তাকে নগরঘাটা ও মাগুরা ইউনিয়নের বয়স্কভাতা এবং ইসলামকাতি ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা সরবরাহ করেন।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে ন্যূনতম মজুরি পেলো চিংড়িচাষিরা

সরকার ২০০৯ সালের ২১ নভেম্বর চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য ন্যূনতম বেতন ঘোষণা করে। আনুষ্ঠানিক খাতটিতে যুক্ত শ্রমিকদের আর্থসামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই ছিল ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের লক্ষ্য। উল্লেখ করা দরকার, ন্যূনতম বেতন শ্রম আইনের অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় অংশ।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংগঠন সেফ (SAFE), চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে শ্রম আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে থাকে। এ উদ্দেশ্যে সেফ চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের ওপর একটি সমীক্ষা চালায়।

সেফ প্রকল্প এলাকায় কতগুলো চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প-কারখানা ন্যূনতম বেতন দিয়ে থাকে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনার জন্য তা জানা প্রয়োজন ছিল। সেফ এর কর্মী আসাদুজ্জামান খুলনার শ্রম অধিদপ্তর থেকে ন্যূনতম বেতন প্রদানকারী চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা জানতে চান। তিনি ২০১০ সালের ১৫ জুলাই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-প্রধান পরিদর্শকের দপ্তরে ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে তথ্য অধিকার আইনের (আরটিআই) আওতায় তথ্যের জন্য আবেদন করেন। উপপ্রধান পরিদর্শক আবেদনপত্র নিতেই অস্বীকৃতি জানান। তাঁর অনীহা দেখে আসাদুজ্জামান কয়েকদিন পরে রেজিস্টার্ড চিঠির মাধ্যমে লিখিতভাবে আবেদন করেন। কিন্তু ২০ কর্মদিবস অপেক্ষার পরও তিনি কোনো জবাব পাননি।

কাজ হচ্ছে না দেখে তিনি আপিল কর্তৃপক্ষের (প্রধান পরিদর্শক, শ্রম অধিদপ্তর) কাছে ডাকযোগে আপিল করেন। এ জবাবে প্রধান পরিদর্শক খুলনা বিভাগের উপ পরিদর্শককে তথ্য দেয়ার পরামর্শ দিয়ে চিঠি পাঠান। এরপর সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে ফোন করে আসাদুজ্জামানকে বলা হয় সাধারণ একটি চিঠি লিখে তথ্য চাওয়ার জন্য। আসাদুজ্জামান সে অনুযায়ী তথ্য চেয়ে উপ-প্রধান পরিদর্শককে চিঠি লেখেন। কিন্তু এবারও কোনো সাড়া মেলেনি।

৩০ সেপ্টেম্বর আসাদুজ্জামান প্রধান তথ্য কমিশনারের কাছে এ নিয়ে অভিযোগ করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার, সেইদিনই আসাদ সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে তাঁর চাওয়া তথ্যসহ একটি চিঠি পান। তবে তথ্যগুলো যে আরটিআই আইন অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে চিঠিতে একথা বলা হয়নি। সরবরাহকৃত তথ্য আংশিক ভুল ছিল। ২০১১ সালের ৩১ জানুয়ারি আসাদ তথ্য কমিশন থেকে একটি চিঠি পান। চিঠিতে তাঁকে ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় শুনানিতে যোগ দিতে বলা হয়। আসাদ তথ্য কমিশনকে প্রদত্ত তথ্যে ভুল থাকার কথা জানান। শ্রম অধিদপ্তর বলেছিল ৩৯টি প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম মজুরি দেয়। আসাদুজ্জামান কমিশনকে জানান, এর মধ্যে একটি আসলে চট্টগ্রামের, সেফ-এর প্রকল্প এলাকার নয়। সেফ-এর প্রাপ্ত তথ্যমতে, ওই এলাকায় চালু প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৪। বাকিগুলো তখন বন্ধ ছিল।

আসাদুজ্জামান প্রথম শুনানিতে উপস্থিত থাকতে না পারায় সময় চেয়ে আবেদন করেন। পরে ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত শুনানিতে তিনি তাঁর অভিযোগের সপক্ষে তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করেন। এর পরে ২১ মার্চের শুনানিতে প্রধান কমিশনার পরের সপ্তাহের মঙ্গলবারের মধ্যে সঠিক তথ্য সরবরাহের জন্য উপ-প্রধান পরিদর্শক বেলায়েতকে নির্দেশ দেন। প্রধান তথ্য কমিশনার এ সময় উপস্থিত বেলায়েতের দুই সহকর্মীকেও তথ্য না দেওয়ার জন্য তিরস্কার করেন। আসাদুজ্জামান অবশেষে ২৭ মার্চ তার চাওয়া তথ্য পান।

দেখা যায়, তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারি কর্তৃপক্ষের কাজের মান বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্যের জন্য অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর আরো সক্রিয় হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে 'সেফ'-এর প্রকল্প এলাকার ৩৭টি চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৭টিই শ্রমিকদের সরকারঘোষিত ন্যূনতম বেতন দিচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরও এখন দৃশ্যত তথ্য দেয়ার ব্যাপারে অধিকতর সক্রিয়।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে কার্ড পেলো প্রকৃত দরিদ্র সন্তানসম্ভবা নারী

সরকার পরিচালিত 'নিরাপদ মাতৃত্ব ভাউচার কার্ড' প্রকল্পের লক্ষ্য দরিদ্র সন্তানসম্ভবা নারীদের প্রসবপূর্ব চিকিৎসা দেওয়া। প্রতিমাসে প্রায় ৭৫ জন দরিদ্র সন্তানসম্ভবা নারীকে একটি কার্ড দেয়া হয়, যার মাধ্যমে তারা শিশুর জন্ম পর্যন্ত প্রত্যেকে স্বাস্থ্য সেবার জন্য আট হাজার টাকা করে পাবে।

কিন্তু মেহেরপুর জেলার কয়েকটি এলাকায় এক্ষেত্রে অনিয়ম করে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল নারীদের এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাদ পড়ে যায় অনেক প্রকৃত অভাবী। এলাকার ভূমিহীনরা তথ্য অধিকার আইনের সহায়তা নিয়ে শেষ পর্যন্ত এর প্রতিকার করতে পেরেছে–

ধানখোলা ও সাহারবাতি ইউনিয়ন ও গাংনী পৌরসভার ভূমিহীন সমিতির সদস্যরা 'নিরাপদ মাতৃত্ব ভাউচার প্রকল্পের' কার্ড বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ পেয়েছিল। ভূমিহীন কমিটির সদস্যরা ঘরে ঘরে গিয়ে গরিব ও সন্তানসম্ভবা নারীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। দেখা যায়, প্রকৃতই যাদের প্রয়োজন তাদের বদলে তুলনামূলকভাবে সচ্ছল পরিবারের অনেক নারীকে কার্ড দেয়া হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া যায় যে, গাংনী পৌরসভা, ধানখোলা ও সাহারবাতি ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণের জন্য ২০০ টাকা করে ঘুষ নিয়েছেন। কর্মকর্তারা একপর্যায়ে কার্ড বিতরণ বন্ধও করে দেন। খুব সম্ভবত দরিদ্ররা ঘুষ দিতে পারেনি বলেই তা করা হয়।

তথ্যের জন্য আবেদন

গাংনী পৌরসভার ভূমিহীন সমিতির সভাপতি ও তিনজন সদস্য ২০১০ সালের ১৯ জুলাই যৌথভাবে আবেদন করে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার কাছে নিরাপদ মাতৃত্ব স্বাস্থ্য ভাউচার প্রকল্পের তথ্য জানতে চান। এতে যেসব তথ্য জানতে চাওয়া হয় তার মধ্যে ছিল—

১) প্রতি মাসে প্রতি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় কতগুলি করে কার্ড বিতরণ করা হবে

২) কার্ড পাওয়ার যোগ্যতার শর্তগুলো কি কি

৩) কার্ড বিতরণের দায়িত্ব কার

৪) কার্ডেরও আওতায় কি কি সেবা থাকে

৫) কার্ডের মাধ্যমে কত টাকা দেয়ার কথা

৬) মনোনীত পরিবারগুলোকে কোনো ফি দিয়ে নিবন্ধন করতে হয় কি না

৭) নিবন্ধন করতে হলে তার ফি কত

মৃত্যুর ঝুঁকি থেকে নিরাপত্তায়
বিলকিস আক্তার

"দ্বিতীয় বাচ্চা পেটে আসার পর চেকআপ করার জন্য আমি তিনবার হাসপাতালে গিয়েছিলাম। আমার বাচ্চা হয় সিজারিয়ান অপারেশন করে। এ বাচ্চার জন্মের আগের তিন মাসে আমি আর্থিক ও চিকিৎসা সহায়তা পাই। এছাড়া বাচ্চা হওয়ার পর শিশুর খাবার ও ডায়পার মতো বিভিন্ন সুবিধা দিয়েছিল হাসপাতাল থেকে।" কথাগুলো জানালেন মেহেরপুর জেলার গাংনী ঈদগাহপুর গ্রামের গৃহবধূ বিলকিস আক্তার। বিলকিস ভূমিহীন সমিতির সদস্য।

বিয়ের পর থেকে স্বামীর পরিবারে অনেক কষ্ট করে দিন চলত। স্বামীর নিজের কোনো জমি বা ভিটাবাড়ি ছিল না। তিনি অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ করেন। প্রথম বাচ্চা হওয়ার সময় নিরাপদ মাতৃত্ব স্বাস্থ্য ভাউচারের বিষয়টি না জানলেও দ্বিতীয় বাচ্চার জন্মের আগে বিলকিস জানতে পারেন। বিলকিস মনেকরেন, নিরপেক্ষভাবে কার্ড বিতরণের দাবিতে গাংনী ভূমিহীন সমিতির সদস্যরা আন্দোলন করলো বলেই তিনি একটি কার্ড পেয়েছেন।

উপকারভোগী এই মা আরো বলেন, "আমার গরিব স্বামীর পক্ষে এ অপারেশন ও এ সময়ের অন্যান্য সাংসারিক খরচ মেটানো মোটেই সম্ভব হতো না। নিরাপদ মাতৃত্ব স্বাস্থ্য ভাউচার প্রকল্পের কার্ড যোগাড়ের ফলেই বিনামূল্যে এ অপারেশন করা সম্ভব হয়েছে। আমার ও আমার নবজাতক শিশুর স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। এই কার্ড আমার পরিবারের খরচ সামলাতেও সাহায্য করেছে।"

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার দেয়া জবাব থেকে জানা যায়, এ পর্যন্ত ধানখোলার ৪৭টি পরিবার ও সাহারবাতির ৩৩টি পরিবার কার্ড পেয়েছে। এতে গাংনী পৌরসভার ব্যাপারে কোনো তথ্য দেয়া হয়নি। ভূমিহীনরা অভিযোগ করেন উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা তথ্য দিতে অনেক সময় নিয়েছেন এবং অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। ভূমিহীনদের স্থানীয় কমিটি ইতোমধ্যেই অনিয়মের ব্যাপারে একটি জরুরি বৈঠক ডেকেছে।

এলাকার ভূমিহীনদের কমিটি ইতোমধ্যেই নিরাপদ মাতৃত্ব স্বাস্থ্য ভাউচার প্রকল্পের অনিয়ম এবং তথ্য দিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যথাযথ সহযোগিতার অভাবের ব্যাপারে একটি জরুরি বৈঠক ডাকে। আরও সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ, প্রমাণ জোগাড় এবং সমর্থন আদায়ের জন্য কমিটি তৎপরতা শুরু করে। এ উদ্যোগের পক্ষে শুভানুধ্যায়ী, পেশাজীবী, নির্বাচিত পৌর মেয়র ও উপজেলা চেয়ারম্যান স্বাক্ষর দেন।

২৯ জুলাই তারিখে ২শ'র বেশি নারী ও পুরুষ প্রকল্পের পক্ষে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করে। মিছিল শেষে সংগৃহীত স্বাক্ষরসহ সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে একটি স্মারকলিপি দেয়া হয়। স্মারকলিপির অনুলিপি দেয়া হয় মেহেরপুর জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা এবং মেহেরপুর ও গাংনী উপজেলার চেয়ারম্যানের কাছে। কার্ড পাওয়ার জন্য ঘুষ দিয়েছিল এমন ২০টি পরিবারের তালিকাও তৈরি করে ভূমিহীনরা।

ভূমিহীনরা পৌরসভার চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের কাছে অনিয়মের প্রমাণ তুলে ধরতে তাদের সঙ্গে একটি মতবিনিময় বৈঠকের আয়োজন করে। ভূমিহীন নেতারা বৈঠকে প্রকল্পটির ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানতে চান। জবাবে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা স্বীকার করেন যে অফিস এবং মাঠ পর্যায় উভয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট তথ্য না থাকায় যথাযথ তথ্য সরবরাহ করা যায়নি। তিনি ভূমিহীন নেতাদের বিস্তারিত তথ্য দেয়ার চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

ভূমিহীনদের আবেদনের মাধ্যমে বিষয়টি জেনে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ১ আগস্ট বিষয়টি তদন্ত করতে আসেন। তিনি দেখতে পান কার্ড বিতরণে অনিয়ম হয়েছে এবং ভূমিহীনদের অভিযোগ সঠিক। এর মধ্যে তিনশর বেশি ভূমিহীন ধর্মচাকী গ্রামের স্কুলমাঠে সমবেত হয়ে সিভিল সার্জনের কাছে ন্যায়বিচার দাবি করেন। সিভিল সার্জন তখন উপস্থিত লোকজনকে উপকারভোগীদের নাম নির্বাচন করতে বলেন। তারা ২০ জন দরিদ্র সন্তানসম্ভবা নারীর নাম দেন। এই নারীদের সবাই পরে কার্ড পেয়েছেন। এদিকে ঘুষ নেয়ার জন্য দায়ী স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। তাকে ঘুষের টাকা ফেরতও দিতে হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

তথ্য অধিকার আইনের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক পাইলট প্রকল্প

তথ্য অধিকার আইনটিকে পরিচিত ও এর ব্যবহার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে একটি পাইলট প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হয়েছে। মানুষ যেন বেশি বেশি করে তথ্য জানতে চায় এবং তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রেও যেন ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায় মূলত এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মানিকগঞ্জ জেলার একটি এলাকাকে পাইলট প্রকল্প হিসেবে নেয়া হয়েছিল। এই প্রকল্পের আওতায় সরকারের ৮টি প্রতিষ্ঠানের ৫৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় এজিও'র পাঁচজন কর্মকর্তাকেও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে– যাতে তারা তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা তৈরি করতে পারে।

প্রশিক্ষণের লক্ষ্য

১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা যেন যথাযথভাবে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে পারে, এজন্য তাদের দক্ষতা বাড়িয়ে তোলা।
২. তথ্য চাওয়ার জন্য তৃণমূল পর্যায়ের মানুষকে সচেতন করে তোলা।
৩. অন্যান্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ মডিউলের সাথে তথ্য অধিকার আইন বিষয়টিকে সংশ্লিষ্ট করা।

কর্মসূচির মূল উপাদান

১. মানিকগঞ্জ জেলার ৭টি উপজেলার ৮টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ।
২. সরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থার প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া।

প্রশিক্ষণ সেশনে গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তারা তথ্য দিতে শুরু করেছেন। এদের অধিকাংশই তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট আন্তরিক এবং তথ্য দিতে অনেক বেশি সময় নিচ্ছে না। প্রশিক্ষিত দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাদের কাছে ইতোমধ্যেই বেশ কিছু তথ্য চেয়ে আবেদনপত্র জমা পড়েছে। তথ্য দেয়াও হয়েছে। অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার যারা প্রশিক্ষণ নিয়েছিল, তারা নিজ নিজ পর্যায়ে উঠোন বৈঠক, নাটক মঞ্চায়ন, সেমিনার, মাইকিং ইত্যাদি করছে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে। এছাড়া ৮টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট TOT গ্রহণ করেছে। আশা করা যায়, তারা তাদের মূল প্রশিক্ষণ মডিউলে তথ্য অধিকার আইনকে সন্নিবেশিত করবে।

শিক্ষণীয় দিক

- তথ্য অধিকার আইন বিষয়টিকে প্রশিক্ষণের মূলধারায় আনার জন্য সরকারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এর দক্ষতা বৃদ্ধি ঘটাতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজন সরকারি-বেসরকারি Partnership.

- তথ্য অধিকার আইনটি যতক্ষণ পর্যন্ত না জীবন ও জীবিকা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সরাসরি জড়িত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি সর্বজনগ্রাহ্য হবে না। এজিওসহ অন্যান্য যেসব সংস্থা তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কাজ করছে, তাদের জানতে হবে কীভাবে এই আইনটিকে খাদ্য, আশ্রয় ও অন্যান্য মৌলিক অধিকারের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

- আইনটিকে কার্যকর করার জন্য শুধু দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিলেই হবে না। পাশাপাশি তথ্যের জন্য চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে জনগণের সচেতনতা বাড়াতে হবে এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের আরো সংবেদনশীল করে তুলতে হবে।

- তথ্যের জন্য আবেদনের জবাব, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ এবং ডকুমেন্টেশন-এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অন দ্য জব প্রশিক্ষণও দরকার।